প্রথম আলো

কলাম

মতামত

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নতুন করে পরীক্ষা কেন

তারিক মনজুর

প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২৭

পরীক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা দক্ষতা বাড়ায় না; বরং পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অবস্থা জানা যায় মাত্র। *ছবি: প্রথম আলো*

অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নতুন করে পরীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি কাজ করেছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, পরীক্ষা নিলে আর কিছু না হোক, শিক্ষার্থীরা অন্তত পড়াশোনা করে; পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবস্থাও বোঝা যায়।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি বড় অংশ প্রবলভাবে পরীক্ষার পক্ষে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব বিষয় হয়তো মন্ত্রণালয় এড়াতে পারেনি। তবে নতুন করে পরীক্ষা চালু করার আগে তাদের দরকার ছিল শিক্ষাবিদদের নিয়ে বসা এবং শিশু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভালো-মন্দ দিক যাচাই করা। কিন্তু আমরা দেখছি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এর মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালে যে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়, সেই শিক্ষাক্রম নিয়ে ব্যাপক আপত্তি ছিল। সেই আপত্তি যতটুকু না ছিল পদ্ধতিগত দিক নিয়ে, তার চেয়ে বেশি ছিল কনটেন্ট বা পাঠ্যবইয়ের উপাদান নিয়ে। তখন নানামুখী ক্ষেত্র ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়, প্রাক্-প্রাথমিক কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরীক্ষা থাকবে না।

আমাদের দেশে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। শিশুশ্রেণিতে পরীক্ষার পক্ষে যেসব শিক্ষক যুক্তি দেখান, লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁরাই মূলত প্রাইভেট পড়ান বা কোচিং করান। নতুন শিক্ষা আইনের খসড়াতেও এ ধরনের কোচিং ও প্রাইভেট নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু আদৌ তা বন্ধ করা সম্ভব কি না, সেটি আরেক প্রশ্ন। কারণ, অভিভাবকেরাও চান বেশি বেশি নম্বর।

তৃতীয় শ্রেণি থেকে পরীক্ষা থাকবে, অর্থাৎ ধারাবাহিক মূল্যায়নের পাশাপাশি সামষ্টিক মূল্যায়নও করা হবে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ হবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, ৩০ শতাংশ হবে চূড়ান্ত পরীক্ষা বা সামষ্টিক মূল্যায়ন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এভাবেই চলবে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ১০০ ভাগ হবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন—প্রচলিত পরীক্ষা বলে কিছু থাকবে না। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন, তাঁরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

নতুন করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরীক্ষা চালু করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, এটি বোঝা দরকার। দুঃখজনক ব্যাপার হলো পরীক্ষা কী এবং কেন নেওয়া হয়, এটি আমাদের মা-বাবা এমনকি অনেক শিক্ষকেরও জানা নেই। পরীক্ষাকে তাঁরা শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের প্রধান উপায় বলে মনে করেন। অথচ পরীক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা দক্ষতা বাড়ায় না; বরং পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অবস্থা জানা যায় মাত্র।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে ক্লাসরত শিক্ষার্থীরা *ছবি: সংগৃহীত*

শিক্ষার্থীর অবস্থা জানা এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ যদি নেওয়া যায়, তবে নিয়মিত বিরতিতে বারবার পরীক্ষা নিতেও বাধা নেই। এটাকেই বলা হচ্ছে ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এই প্রক্রিয়ায় বইয়ের কোনো একটি অধ্যায় বা অংশ শেষ করে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে পারেন। এর মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারা ওই পাঠের নির্ধারিত যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে; আর কারা পারেনি।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিখনঘাটতি বা শিখন-দুর্বলতা যাচাই করা। একজন ভালো শিক্ষক অবশ্য পাঠদানকালেই সেটি মোটামুটি বুঝতে পারেন। তা ছাড়া সব শিক্ষার্থীর শিখনঘাটতি একরকম থাকে না।

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনঘাটতি শনাক্ত করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। নতুন অধ্যায় বা পাঠ শুরু করার আগেই এই কাজ করতে হয়। অথচ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সুযোগ থাকে না। কারণ, বছরে একটি বা দুটি চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফল এবং সেই অনুযায়ী শ্রেণিতে তাদের ক্রম বা অবস্থান নির্ধারণ করা যায়; কিন্তু তখন আর শিখনঘাটতি দূর করার মতো সময় থাকে না।

আমাদের দেশে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। শিশুশ্রেণিতে পরীক্ষার পক্ষে যেসব শিক্ষক যুক্তি দেখান, লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁরাই মূলত প্রাইভেট পড়ান বা কোচিং করান। নতুন শিক্ষা আইনের খসড়াতেও এ ধরনের কোচিং ও প্রাইভেট নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু আদৌ তা বন্ধ করা সম্ভব কি না, সেটি আরেক প্রশ্ন। কারণ, অভিভাবকেরাও চান বেশি বেশি নম্বর।

শ্রেণিতে সন্তানের ক্রম বা রোল নম্বর নিয়েও তাঁদের চিন্তা থাকে। এ কারণে সন্তানকে প্রতিনিয়ত পড়ার জন্য তাঁরা চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন এবং নম্বরকে পড়াশোনার প্রধান মানদণ্ড বলে মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকই উদ্যোগী হয়ে সন্তানকে শিক্ষকের কাছে 'প্রাইভেট' পড়াতে পাঠান, আর সেটি না পারলে অন্তত 'ভালো নোট' সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেন।

এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ ও নেতিবাচক প্রচেষ্টা শিশুকাল থেকেই শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবিমুখ করে তোলে। এমনকি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা নিজে উত্তর লেখার সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে।

তা ছাড়া অভিভাবকদের কারণে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনাকে 'প্রতিযোগিতা'র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখে। যে কারণে তাদের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারটি হারিয়ে যায়। অথচ একেকটি বিষয়ের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের পরস্পরকে সহযোগিতা করার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের মূল্যায়নকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষার উদ্দেশ্য—সেরা শিক্ষার্থী বা যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা। সেখানে পাস-ফেল গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো যোগ্যতা অনুযায়ী ক্রম নির্ধারণ করা। অন্যদিকে স্কুলের পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর অবস্থা যাচাই করা এবং সেখানে কোনো ঘাটতি বা দুর্বলতা থাকলে তা পূরণের ব্যবস্থা করা। একমাত্র ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমেই তা কার্যকরভাবে করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকায় স্পষ্ট করা দরকার, পাঠ্যবইয়ের কোন অধ্যায় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে, এমনটাই আমরা আসা করতে পারি। প্রাথমিকের সব শ্রেণিতে না হলেও অন্তত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরীক্ষা বাদ দিন। শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে যদি সত্যিকার অর্থে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে এর বিকল্প নেই। আরেকটি কথা, ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো নম্বর রাখা যাবে না। শিক্ষার্থী নির্ধারিত দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে কি না, সেটিই হবে প্রধান বিবেচ্য।

- • **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো